গান্ধি রাজনীতি ও নিম্নবর্গের মানুষ

অরবিন্দ সামন্ত

এক : প্রস্তাবনা :

ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন-কামনায় উদ্বেল জনগণমনকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রণোদিত করেছিলেন যে মানুষটি তিনি নিঃসন্দেহে গান্ধিজি। গান্ধি শুধু এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন না, তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গণমুক্তির আন্দোলনের অভীষ্টে চালিত করেছিলেন। প্রাক-গান্ধি পর্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ছিল 'ভদ্রলোক'দের আধিপত্য। এই এলিট-মনস্ক আন্দোলনকে গান্ধি গণমুখী করে তোলেন। কংগ্রেসি আন্দোলনে যে উপরিতল আধিপত্য, গান্ধি তাকে খর্ব করেন। 'জাতির জনক' হতে গেলে জাতির সংখ্যাধিক্যের ভাষা, গরিষ্ঠের পোশাক-আশাক, খাদ্যপানীয়, প্রাকৃতজনের লৌকিক ইডিয়মকে স্বীকরণ করতে হয়। গান্ধি সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এ নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল : 'জাতির জনকে'র সঙ্গে সন্তানদের মানসিক সাযুজ্যময়তা কতদূর ছিল? নিম্নবর্গীয় ভারতবর্ষের গণমানসকে তিনি কতদূর বুঝেছিলেন! সন্তানরা কি সমর্পণে দ্বিধাহীন, নাকি মান্যতায় দুর্বিনীত! সন্তানরা যদি শুধুই অনুগামী হয়ে থাকে, তাহলে অনুগমন কি নিরবধি, প্রশ্নাতীত! জন-আন্দোলনের কি কোনও চৈতন্য ছিল না? জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক চৈতন্য থাকলে আমরা মানতে পারি সন্তানদের সাবালকত্ব। গান্ধি কি এই সন্তানদের সাবালকত্বে স্বস্তিহীন! নাকি অভিনব অস্বস্তিতে পীড়িত! এই জাতীয় কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন নিয়ে এ-প্রবন্ধের শিরোনাম।

গান্ধি-পরিচালিত কয়েকটি আন্দোলনের আমাদের ভাবনা যাতায়াত করবে এই প্রবন্ধে। গান্ধি-পরিচালিত মানে গান্ধিকে প্রত্যক্ষত সেই আন্দোলনের শিরোভাগে প্রস্তুত থাকতে হবে এমন নয়। সেই আন্দোলনও আমাদের উপজীব্য যেখানে গান্ধি অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির অনিবার্যতায় আন্দোলন আরও বেশি বেগবান, স্বতঃস্ফূর্ত। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ প্রবন্ধের চারণভূমি। এই চারণক্ষেত্রের ভ্রমণপর্বে আমাদের তিনটি ল্যান্ডমার্ক : ক. অসহযোগ আন্দোলন, খ. আইন অমান্য আন্দোলন আর গ. ভারত ছাড়ো আন্দোলন। গান্ধি পরিচালিত কিংবা অনুপ্রাণিত এই তিনটি আন্দোলনে নিম্নবর্গের সামিল হওয়া, কিংবা শামিল হয়ে বেসামাল হওয়া আমারা লক্ষ্য করব।

দুই : অসহযোগ :

নতুন সংগঠন, নতুন নেতা আর নতুন কর্মপন্থা নিয়ে শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ বিরোধী প্রথম গণ-আন্দোলন—অসহযোগ আন্দোলন। গান্ধির ইচ্ছা ছিল অসহযোগের তীব্রতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে আন্দোলনকে আইন অমান্যের দিকে নিয়ে যাবেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এক

চাষিদের অভিযোগ ছিল অতিরিক্ত খাজনা, নজরানা। বেগার আর ঠিকাদারি অত্যাচার। এর সঙ্গে জড়িয়েছিল জাতপাতের লড়াই। উঁচু জাতের ব্রাহ্মণ-ঠাকুর প্রজার সঙ্গে নীচুজাতের কুর্মি-মুরাও প্রজাদের জমিজোত নিয়ে রেষারেষি। রেষারেষি কারণ, উঁচুজাতের চাষিরা নীচু জাতের চাষিদের চেয়ে খাজনা দেয় কম।

কিষান আন্দোলনের দুটো ধারা। একটা উপর থেকে চাপানো। এদের নেতা কে ডি মালব্য আর পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন। অন্যটায় সামিল প্রতাপগড় আর রায়বেরিলির কুর্মি-মুরাও চাষিরা। এরা ঘোষণা করেছিল : 'আমরা গান্ধি আর সরকারের পক্ষে।' গান্ধির রামরাজ্য তাদের স্বপ্ন, সীতারাম তাদের 'নারা'। চাষিরা প্রতিবাদ জানিয়েছিল বিনা টিকিটে রেলে চড়ে আর রেলপথ অবরোধ করে। রায়বেরিলিতে দোকানপাট লুট হয়। ব্রাহ্মণ-ঠাকুর জাতের জমিদারদের উপর আহির, চামার, লুনিয়া শ্রেণির ভূমিহীন চাষিরা চড়াও হয়। নেতা রামচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। তালুকদাররা পিঠ বাঁচাতে গড়ে তোলে 'আমন সভা'। বিদ্রোহ শেষ। আসলে কংগ্রেসি নেতারা কিষানদের দাবিদাওয়াকে জাতীয়তাবাদী কর্মসূচির সঙ্গে মেলাতে পারেনি। গান্ধি গেয়েছেন জমিদার-কিষান ঐক্যের গান : 'আমরা জমিদারদের সঙ্গে লড়তে চাই না। জমিদাররাও ক্রীতদাস। আমরা তাদরে অনিষ্ট চাই না।'

বাংলার মফসসলে আন্দোলন হিংসার রূপ নেয়। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, রাজশাহি আর মুরশিদাবাদের জমিদারিতে আদিবাসীরা দাঙ্গা বাধায়, হাট আর মাছের ভেড়ি লুট করে। জঙ্গল হাসিল করে নেয়। সাব অলটার্ন ঐতিহাসিকরা দেখেছেন জঙ্গলমহল, বাঁকুড়া ও সিংভূমে আদিবাসী চৈতেন্যর স্ফূরণ। 'দিকু' বা বহিরাগতদের উপর আদিবাসীরা আগে থেকেই বিরূপ ছিল। তাতে ইন্ধন জোগাল জিসিপত্রের দাম আর আদিবাসীদের মহাজনী ঋণ। বিদ্রোহ গ্রামে গ্রামে লুটের চেহারা নিল।

মাদ্রাজে শ্রমিক আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। রাজধানীর বাকিংহাম কর্ণাটক মিলে চারমাস ধর্মঘট চলে। সরকার এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য 'আদি দ্রাবিড়' জাতের অস্পৃশ্যদের ক্ষেপিয়ে দেয় উঁচুজাতের শ্রমিকদের উপর। আর এই দাঙ্গা ঠেকানোর জন্য গান্ধি অনুগামীরা ধর্মঘটী শ্রমিকদের হাতে হাতে চরকা ধরিয়ে দিলেন। অন্ধ্রে উপকূল এলাকার খাজনা বন্ধ আন্দোলন জোরদার হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস : 'গান্ধিস্বরাজ আসবে শোনা যাচ্ছে। আমাদের আর কোনও কর দিতে হবে না।' ঝাড়গ্রামের সাঁওতালদের মতোই অন্ধ্রের পাহাড়িয়ারা গরিব চাষিদের সঙ্গে মিলেমিশে বন-আইন বেপাত্তা করেছিল।

মালাবারের মোপলা অধ্যুষিত অঞ্চলেও লেগেছিল ন্যায় রাজ্য আবির্ভাবের আশার ঢেউ। সেখানকার হিন্দু মহাজনদের অত্যাচারে মুসলিম প্রজারা অতিষ্ট। গেরিলাযুদ্ধের কায়দায় প্রায় দশ হাজার লোক লড়াই-এ নেমেছিল। আক্রমণের আরম্ভিক লক্ষ্যস্থল ছিল রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতীক পুলিশ। ক্রমে তা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নেয়। প্রায় ছশো হিন্দু নিহত হল। ধর্মত্যাগে বাধ্য করা হল প্রায় আড়াই হাজার হিন্দুকে।

পাঞ্জাবে অসহযোগ আকালি আন্দোলনের রূপ নিল। পাঞ্জাবে গুরুদ্বারগুলির উপর

আধিপত্য বহুকাল ধরে লম্পট আর লোভী মোহান্তদের। শিখদের ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। অসহযোগের সুযোগ পাঞ্জাবের জাঠ চাষি আর শিরোমণি আকালি দল আন্দোলনে নেমে পড়ে। গুরুদ্বারের কর্তৃত্ব কায়েমের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হল খাজনাবন্ধ আন্দোলন।

গুজরাটের বারদোলি তালুকে নীচুজাতের উপজাতি মজুর 'কালিপরাজ'রা উঁচুজাতের 'উজালিয়াও'দের উপর চড়াও হতে পারত। কংগ্রেসীরা কঠোর শৃঙ্খলায় এই শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব ঠেকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু খেড়ায় বরাইয়াদের ঠেকানো যায়নি। অসহযোগের সুযোগ এক বছরেই নিদেনপক্ষে ৭০টা ডাকাতির ঘটনা তারা ঘটিয়েছিল।

হিংসার এই উলঙ্গ প্রকাশ, বিদ্বেষ ও হানাহানির এই প্রকাশ্য উন্মোচনে গান্ধি আতঙ্কিত হন। গান্ধি জানতেন না, অসহযোগের নামে তিনি খুলেছেন প্যানডোরার বাক্স। নিম্নবর্ণের আবেগতপ্ত বাসনায় তিনি দিয়েছেন অতিরিক্ত উত্তাপ। তাই বেরিয়ে এসেছে শতাব্দী লালিত মানুষের অনিবার্য সন্তাপ। বহু দ্বিধা নিয়ে তিনি শুরু করলেন গুন্টুরে আইন অমান্য। বারদৌলির আইন অমান্য পিছিয়ে দিলেন দু-দুবার। শেষে শোনা গেল, গোরখপুরের চৌরিচৌরায় জনতা বাইশ জন পুলিশকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে। গান্ধির পক্ষে এই যথেষ্ট। তিনি শুনলেন না, চৌরিচৌরার নেতা ভগবান আহিরের উপর পুলিশের অমানুষিক বেত্রাঘাতের কথা, জানলেন না থানার সম্মুখে সমবেত জনতার উপর পুলিশেল গুলি চালনার কথা। তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। গান্ধি নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম আন্দোলনের উপর যবনিকা নেমে এল এইভাবে।

আর এইভাবেই, অসহযোগের মধ্য দিয়ে, খিলাফতকে সমর্থন করে, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার স্বপ্নসম্ভব প্রকল্পনাও ব্যর্থ হল। ব্যর্থ যে হবেই তা জাতির জনক জানতেন না। জানতেন একজন কবি। রবীন্দ্রনাথ। স্বরাজ লাভের এমন সুলভ সম্ভাবনায় হিন্দু-মুসলিম তাদের শতাব্দী প্রাচীন মানসিক ব্যবধান ভুলে যাবে একথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন না। কারণ তিনি জানতেন, বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকে মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও অন্যকে মারতে পারে না। অন্যদিকে, মুসলমান বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম প্রহার করে। তার কারণ মুসলমানের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। সুতরাং এই মানসিক অবরোধ না ভেঙে ব্রিটিশ শাসনের অবরোধ ভাঙতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের তালিমের জন্য অসহযোগে উভয়কে সামিল করার চেষ্টা। কবির কাছে, হাস্যকর।

আর নিম্নবর্ণের কথা? সুদীর্ঘ প্রস্তুতি ছাড়া অহিংস মনন কেমন করে সম্ভব? হিংসা লোকজীবনে বদ্ধমূল বিশ্বাস, চৈতন্যে লালিত, দৈনন্দিনে, জীবনযাপনে পরিবর্ধিত। একদিনের নির্দেশে বৎসরান্তিক পরীক্ষায় তা সফল হবে এমন আশা সাধুসন্তরাই করতে পারেন। তিনি রামরাজ্যের স্বপ্ন জাগিয়েছেন গণমনে, কিন্তু তার পথ প্রস্তুত করতে গেলে তিনিই পথ আগলে দাঁড়িয়েছেন। আসলে গণ-আন্দোলনকে সীমার মধ্যে রাখতে গেলে নৈতিক প্রশিক্ষণ বা রাজনৈতিক কৌশলই শেষ কথা নয়, জনগণের প্রাথমিক সমস্যা, আশু প্রয়োজনগুলিও

দেখতে হবে। স্বরাজ আসছে বলে তো পেটের খিদে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। চাপা দিয়ে রাখা যায় না যুগযুগান্তের পুঞ্জিত অভিমান। তাদের দুঃখ-দুর্দশার কারণ বড়জাত বা জমিদার নয়, ঔপনিবেশিক শোধন, এইসব তত্ত্ব বোঝাতে সময় লাগে। জিনিসপত্রের চড়া দাম, খাজনার চাপ, জমি হস্তান্তর, সেচ, সহজলভ্য ঋণ ইত্যাদির সমাধান ও উন্নতির প্রতিশ্রুতি না পেলে সাধারণ মানুষ তাদের হাতের কাছের সুপরিচিত শোষক জমিদার কিংবা মহাজনকে আঘাত হানবেই।

তবুও নিম্নবর্ণ গান্ধিকেই মেনেছিল। মেনেছিল কারণ অরবিন্দের 'স্বরাজ্য', আদিবাসীদের 'চম্পা' আর গান্ধিমহারাজের 'রামরাজ্য' যে অভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন কুসুম। তাই নানা ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাদের আশা নির্মূল হয়নি। তারা গান্ধিকেই ঈশ্বর, ধর্ম আর পুণ্যের সমান্তরালে আঁকড়ে ধরেছে। গুরুবাদী ভারতবর্ষের হাজার বছরের সংস্কার কি এত সহজে যায়!

তিন : আইন অমান্য :

অসহযোগ আন্দোলনের প্রায় দশ বছর পরে গান্ধির নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ আর আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতে গণ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল। ১৯২৯ সালে, লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণস্বরাজ প্রস্তাব গৃহীত হল। 'পূর্ণস্বরাজে'র দাবি বুদ্ধিজীবীদের বাগাড়ম্বর নয়। নয় কংগ্রেসিদের কৌশলগত রাজনৈতিক অবস্থান। এর পিছনে ছিল সর্বশ্রেণির, সর্বস্তরের মানুষের দুঃখবরণের অঙ্গীকার, ত্যাগ স্বীকারের প্রতিশ্রুতি আর দৃঢ় সংগ্রামের প্রত্যয়। ব্রিটিশ শাসন মানেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ আর ধনতান্ত্রিকনির্ভর গণশোষণ, তায়ই চাই ব্রিটিশ সামরিক শক্তির ধ্বংস আর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অপসারণ। চাই ন্যূনতম মজুরি, শ্রমদিবস হ্রাস, সমবায়িক ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়ন্ত্রিত শিল্পস্থাপন, আর কৃষকদের জন্য ভূমি স্বত্ব। প্রয়োজন হলে হিংসার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। তবে অহিংসাকে নিতেই হবে কৌশলগত কারণে। আপাতত আন্দোলনের শুরু হবে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন দিয়ে, শেষ হবে কর বর্জনে—সম্ভব হলে সাধারণ ধর্মঘটে।

১৯২৯শের ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারোটায় বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে ইরাবতীর তির কাঁপিয়ে কংগ্রেস পূর্ণস্বরাজের প্রস্তাব নিল। গান্ধি ঘোষণা করলেন, লবণ আইন অমান্য করে শুরু হবে তাঁর নতুন আন্দোলন। ১২ই মার্চ অর্ধনগ্ন ফকির জরাজীর্ণ হাতে দীর্ঘ যষ্টি তুলে নিয়ে সবরমতী থেকে সুদূর আরব সাগরের উপকূলে ডান্ডি অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। তাঁর পায়ের তলায় কেঁপে উঠল উত্তাল ভারতবর্ষ। গান্ধি যাত্রা শুরু করেছিলেন ৭৯ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে। তাঁর যাত্রা শেষ ৬ই এপ্রিল; সারা ভারতবর্ষ তখন তাঁর অনুগামী।

প্রথমে আসা যাক বাংলায়। কলকাতা শহরে বিলেতি বস্ত্রবর্জন; বিলেতি কাপড় আর মদের দোকান পিকেটিং ইত্যাদিতে তোড়জোড় পড়ে যায়। কিন্তু মফসসলে এ আন্দোলন তেমন বাড়েনি। বাড়েনি কারণ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনে স্বরাজীরা প্রজাবিরোধী ভোট দিয়েছিল। গান্ধিবাদীরা মফসসল উন্নয়নে রামরাজ্যের মহিমাকে মেনেছেন, কিন্তু

জমিদারি প্রথার মধ্যে কোনও ত্রুটি খুঁজে পাননি। তাই অনেক জায়গায় হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মুসমলান আর নমঃশূদ্র বর্গাদাররা আলাদা অভিযান চালিয়েছিল। কর বর্জন শুরু হয় আরামবাগে, বালুরঘাটে, কাঁথিতে, বিক্রমপুরে। গ্রেফতার, ফসল নষ্ট, গোলাবাড়ি লুঠ, অগ্নিদাহ কোনওকিছুই গ্রামবাসীদের মনোবল টলাতে পারেনি। সন্দেহ নেই, গান্ধির অহিংসনীতি এখানেই সব বড় কঠিন পরীক্ষা পার হয়েছিল।

কিন্তু পাঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায় আইন অমান্যে যোগ দেয়নি। গান্ধি শিখদের পক্ষে আনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। শিখদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আইন অমান্যকে দুর্বল করে দেয়। তারা সিং গোষ্ঠী আন্দোলনের সমর্থন করেছিল কিন্তু খড়্গা সিং গোষ্ঠী দূরে থাকে। আর হিসার ও রোটকে যারা আন্দোলনে সামিল হয় তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল মহাজন আর মজুতদার।

মাদ্রাজে কংগ্রেস খাজনা বন্ধের আন্দোলনে যায়নি। তাই তাঞ্জোরের ফল্লার শ্রমিক আর দরিদ্র চাষিরা আন্দোলনে যোগ দেয়নি। লবণ আইন অমান্য হয়েছিল ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত অঞ্চলে। আর্কটের বেকার তাঁতি আর মাদুরায় দরিদ্র চাষিরা আন্দোলনে যোগ দেয়। তবে তাদের তাগিদ ছিল জাতে ওঠায়, গান্ধির আনুগত্যে নয়। নাদাররাও আন্দোলনে যোগ দেয়। নাদাররা জাতে নীচু, তালগাছে তাড়ি থেকে দিন গুজরান করে। এখানেও কাজ করেছে জাতে ওঠার তাগিদ।

বিহারে খাজনার চাপ অপেক্ষাকৃত কম থাকায় কৃষক আন্দোলন জোরদার হয়নি। ছাত্রগোষ্ঠী আর উকিলরা কেউই আন্দোলনে নামেননি। ছোটনাগপুরে বঙ্গা আর সোমরা মাঝি জাতীয় দাবির সঙ্গে নিম্নবর্ণীয় দাবিই জুড়ে দিয়েছিল। এখানকার আন্দোলনের প্রকৃত নেতা ছিল ছোট জমিদার ও উকিল আর বড় জমিদাররা সরকারের পক্ষে। হিংসার উপর গান্ধির নিষেধাজ্ঞা এখানে বারবার ভেঙে পড়ে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সাঁওতালরা লুকিয়ে ছাপিয়ে দেশি মদের ভাটিতে গান্ধির পতাকার তলায় তলায় মদ বানাতে থাকে।

আসামে আইন অমান্যে সাড়া পড়েনি। আসামে অসমিয়া-বাঙালি দ্বন্দ্ব, হিন্দু-মুসলিম লড়াই, আর ভূমিজ চাষিদের সঙ্গে বাঙলার উদ্বাস্তুদের মন কষাকষি আন্দোলনকে দানা বাঁধতে দেয়নি। কংগ্রেসি নেতা তরুণরাম ফুকন কিংবা এন. সি. বরদোনি কারোরই আন্দোলনে গা ছিল না। কংগ্রেসিরা আসামের চা বাগিচার কুলি-শ্রমিকদেরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি।

অন্ধ্রের মালাবারে আন্দোলনের পথে দুস্তর বাধা ছিল। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ কিংবা জাতপাতের কাঠিন্য। শিক্ষা, চাকরি, জমি জিরেতে অবিসংবাদী আধিপত্য ছিল নায়ারদের। এদের পক্ষে নিম্নবর্ণীয় এজুভা, পুলায়া কিংবা পরায়াদের পার্থক্য আসমান-জমিন। নাম্বুদ্রিপাদের মতো কিছু বামপন্থী নেতা এই ব্যবধান অগ্রাহ্য করে আন্দোলনে শামিল হলে, লবণ আইন অমান্য ও কাপড় বয়কট করলে, স্থানীয় দোকানদাররা তাদের উপহাস করে।

আন্দোলন জোরদার হয়েছিল গুজরাট আর ইউ.পি. তে। আর সত্যিকারের তৃণমূল আন্দোলন হয় কৃষকদের মধ্যে। গুজরাটে কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় সমর্থক হল পটিদার

সম্প্রদায়। পটিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। তারা অহিংস আন্দোলনের চেয়ে হিংসাত্মক আন্দোলনের দিকে ঝোঁকে। কৃষকদের সাহায্য পাওয়া আরও সহজ হয় প্রাকৃতির মারে। ১৯২৯-৩০ সালে অনাবৃষ্টি আর খরায় ফসল মার খেল। গান্ধির কর বর্জনের ডাকে সাড়া দিল তারা সাগ্রহে। সরকার ফসল ক্রোক করার চেষ্টা করলে খেড়ার চাষিরা অনেকেই বরোদায় আশ্রয় নেয়। গুজরাটি বণিকরাও অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে আন্দোলনে যোগ দেয়।

উত্তরপ্রদেশের আগ্রা আর রায়বেরিলিতে অধিকাংশ জমি ছিল ছোট জমিদার আর ধনী চাষির দখলে। অনেক চাষিরই দখলিদার স্বত্ব ছিল। কিন্তু খাজনার হার ছিল চড়া তাই অনেকেই ঋণগ্রস্ত। রায়বেরিলিতে ৬৬% জমির মালিক ছিল তালুকদার যারা খাজনা আদায়ের ব্যাপারে বেশ কেতাদুরস্ত ছিল। এখানে ভূমিহীন চাষির সংখ্যাই বেশি আর যে চাষির জমি আছে তাদের স্বার্থরক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই। সঞ্চয় নেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে। কায়ক্লেশে দিন গুজরান কোনওরকমে। এর উপর তিরিশে বিশ্বমন্দার আঘাত। ফসলের দাম কমে হল অর্ধেক। তুলোচাষি, গমচাষি সকলেই সমান মার খেল। মীরাট এলাহাবাদের দোয়ার থেকে অযোধ্যার দক্ষিণ-পূর্ব—সর্বত্রই খাজনা মেটাতে দেউলে হল। তাই সকলেই আইন অমান্যে সামিল হল। আন্দোলনের সূত্রপাত খাজনা বন্ধ দিয়ে।

কিন্তু সর্বত্রই আন্দোলন স্তব্ধ হল গান্ধি-আরউইন চুক্তির শর্ত আরোপে। অসহযোগে যেমন চৌরিচৌরা, আইন অমান্যে তেমন গান্ধি-আরউইন চুক্তি। গান্ধি বললেন, আন্দোলনের প্রকৃতি বদলে গেছে। এখন খাজনা বন্ধ নয়, এবার খাজনা হ্রাসের লড়াই, সরকারের সঙ্গে। আরুইন খবর পাচ্ছিলেন আন্দোলনের গতি মন্দীভূত হচ্ছে। স্থানে স্থানে আন্দোলন ছত্রখান, কোথাও অন্তর্দ্বন্দ্বে ম্রিয়মাণ। তাই সরকারি দমন-পীড় তুঙ্গে উঠল। গান্ধি বুঝলেন, আইন অমান্যের রশি টেনে না ধরলে ঘটবে বৃহত্তর হত্যাকাণ্ড। তাই বাস্তবিক বিপর্যয়ের আগেই গান্ধি আদর্শগত বিজয়ের গৌরব লুণ্ঠিত হতে দিলেন না!

সত্যিই কি তাই! আরউইন যে গান্ধিকে আন্দোলন স্থগিত রেখে বিলেতে আলোচনার গোলটেবিলে তুললেন তাতে জিতলেন আরুইন। নাকি, ভারতীয় বণিক শিল্পপতি আর জমিদারদের আবেদন গান্ধিকে টলিয়েছিল! কারণ পাঞ্জাবের অমৃতসরে দুবছর আগে যেখানে গড়ে ২৫ লাখ টাকার বিলেতি কাপড় বিক্রি হত, আইন অমান্যের বছরে সেখানে বিক্রি হল মাত্র ২ লাখ। ধনী ব্যবসায়ী সি এল নায়ারকে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হল। বোম্বাইয়ের মুলজি জেঠা বাজার বন্ধ হয়। দিল্লি কানপুরের বণিকরা অসন্তুষ্ট। একটার পর একটা কারখানা বসে যাচ্ছে। বেকার হচ্ছে হাজার হাজার শ্রমিক। ভারতীয় বুর্জোয়ারা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গান্ধিকে ধরে বসলেন সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। অথচ আন্দোলন চালাতে ওরাই টাকা দিয়েছিল। রজব আলি, বি. দেশাই, মতিলাল নেহরু, বিড়লা—এরা সকলে আইন অমান্যে অর্থ দিয়ে মদত দিয়েছিল। আমেদাবাদের সব শিল্পপতি অর্থ দেয়নি, কিন্তু দিয়েছিল বিভিন্ন প্রদেশের বণিক। বিহারের জমিদাররা!

চাঁদা দিয়েছিল দোকানদার, কন্ট্রাক্টর। গান্ধি এদের লাভলোকসানের প্রশ্নকে একেবারেই বেপাত্তা করে দেবেন!

সুতরাং গান্ধি সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার রাস্তায় গেলেন। নেহরু তো রাগের মাথায় বলে ফেলেন, 'বাবা বেঁচে থাকলে এমনটি হত না।' আত্মজীবনে তিনি এলিয়টকে উদ্ধৃত করে লিখলেন : 'This is how the world ends/not with a bang but a whimper.' আসলে জওহরলালের এই ক্ষোভ ও ব্যথাদীর্ণ মনোভাবের কারণ ছিল গান্ধি গুজরাট আর উত্তরপ্রদেশের নিম্নবর্ণের কিষানদের কথা ভাবলেন না? সাবঅলটার্ন ঐতিহাসিকরা তো গান্ধি সম্বন্ধে শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতক শব্দটিই ব্যবহার করেননি। তাদের সমালোচনার সুর কড়া। গান্ধি-আরউইন চুক্তিতে সরকারি বাজেয়াপ্ত জমি ফিরিয়ে দেবার কথা ছিল না। সুতরাং গান্ধি কৃষকস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এমন চুক্তি মেনে নিলেন!

গান্ধিকে বোঝান হয় কংগ্রেসিরা জমিদারদের বিরুদ্ধে কিষানদের উস্কানি দিচ্ছে। অনেক গান্ধির সামনে বিপ্লবী কিষান আন্দোলনের আতঙ্কের ছবি তুলে ধরেন। বলা হয় চাষিরা খাজনা দিচ্ছে না, হিংসা ছড়াচ্ছে। গান্ধি বলতে পারতেন, কংগ্রেস গরিব চাষিদের বন্ধু, সুতরাং পরামর্শ দিতে পারে। গান্ধি বলতে পারতেন, খাজনার দাবি ন্যায্য কিনা খোঁজ নেওয়া হোক। পক্ষান্তরে, আরউইনের সঙ্গে যে চুক্তি হল তাতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কথা নেই। গ্রামাঞ্চলে গরিব চাষিদের ঋণ মুকুবের কথাও নেই। মৌলিক অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের কথাও নেই।

আসলে কোনও অনগ্রসর আধা-ঔপনিবেশিক দেশে যখন বুর্জোয়া নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ঘটে তখন গ্রামীণ সামন্তশ্রেণিই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। আর ওদের সাহায্যেই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শাসন আর আধিপত্য বজায় রাখে। সাম্রাজ্যবাদের এই ভিত না ভাঙতে পারলে সামন্ততন্ত্রকেও হঠানো যায় না। সাবঅলটার্ন ঐতিহাসিকরা নিম্নবর্ণের কৃষকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত চেতনার সন্ধান পেয়েছেন। প্রয়োজনে অহিংস প্রতিরোধে এ সময় সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। এলাহাবাদে কিংবা রায়বেরিলিতে নিম্নবর্ণের চাষিরাই কংগ্রেসকে বাধ্য করেছিল জমিদারদের উপর চাপ দিয়ে খাজনা কমাতে। তাদেরই চাপে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির দাবির তালিকায় জমিদারি উচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। ভূমিহীন চাষিরা কংগ্রেসের মানচিত্রে এলে পরিস্থিতির বদল হত, সাব অলটার্নরা আশা করেন।

সাব অলটার্ন ঐতিহাসিকদের মতে, গান্ধির গণআন্দোলন পরিচালনার সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠেছে প্রেমচন্দ্রের 'গোদান' উপন্যাসে। প্রতিবেশী গ্রামের আহির মুখিয়ার কাছ থেকে গরু পেয়েছে হরি, দান হিসেবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের শুরু হয়েছে ঈর্ষাকাতর গাত্রদাহ। গরুটাকে হরির নিজের ভাই মেরে ফেলেছে বিষ খাইয়ে। হরির একমাত্র ছেলে মুখিয়ার বিধবা মেয়েকে অন্তঃস্বত্ত্বা করে পালিয়েছে। হরির পরিবার কলঙ্কের ভারে বিপর্যস্ত। বিপর্যস্ত সে আর্থিক অনটনে। আখ বিক্রির টাকা মহাজনের ঘরে, তবু বাকি বহু দেনা। হরি ভাবে শ্রমিক হয়ে সে রুটি জোগাবে। বউ বলে, গ্রামে কাজ কোথায়? হরি তার চারপাশে

কোথাও কংগ্রেসকে দেখতে পায়নি। 'গোদান' উপন্যাসকে প্রতীক কল্পনা করে সাবঅলটার্ন ঐতিহাসিকদের নালিশ : আন্দোলনের সামাজিক গভীরতা কমেছে, বাড়েনি। আমরা 'গোদানে'র পাশাপাশি শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' কিংবা 'অভাগীর স্বর্গ'-এর কথা তুলতে পারি। তুলতে পারি তারাশংকরের 'গণদেবতা' বা 'পঞ্চগ্রামে'র প্রসঙ্গ। 'গণদেবতা'র কংগ্রেসের হয়ে জনমত গঠন করেছে দেবু মাস্টার। দেবুর সঙ্গে অনিবার্য সংঘর্ষ ঘটেছে উচ্চবর্ণের, উচ্চবিত্তের, মহাজনের। গ্রামীন জীবনের অন্তর্নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্ব স্তরে বিস্তরে বিস্তৃর্ণ। তাই আন্দোলনকে সমাজের গভীরে ছড়িয়ে পড়তে দেয়নি, সত্যি কথা। কিন্তু একথাও তো মিথ্যে নয়, দেবুর পরিকল্পনায় আদর্শবাদের আতিশয্য গ্রাম্যজীবনের নিম্নকোটির গতিধারায় ছন্দপতন ঘটিয়েছে। দেবুর অধিষ্ঠান এক অত্যুচ্চ আদর্শলোকে, নিম্নবর্গের জীবনযাত্রা ও মনোভাবের অনধিগম্য দূরত্বে। এই দূরত্ব গান্ধি রাজনীতির সীমাবদ্ধতা।

চার : ভারত ছাড়ো :

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূর্যাস্তের আগে শেষ কয়েকটি বছরে ইতিহাসের ঘটনাপ্রকৃতি দ্রুত বদলে যেতে থাকে। আইন অমান্যের সময় থেকেই আমরা দেখেছি ব্যাপক গণজাগরণ। এই গণজাগরণের অনিবার্য যাত্রাপথে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাঁকটি হল ১৯৪২ সালের অগাস্ট আন্দোলন : 'ভারত ছাড়ো'। এই সময়ে গান্ধি আকস্মিকভাবে জঙ্গি মেজাজের পরিচয় দিতে থাকেন। তবে এই স্থানাভাবের পরিবর্তন ঠিক আকস্মিক নয়। কারণ তিরিশের দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দা। সোভিতে রাশিয়ায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সমাজবাদের প্রসার অনেক নেতাদের আকৃষ্ট করেছে। বামশক্তি দেশব্যাপী ট্রেড ইউনিয়ন, কিষান সভা, ছাত্র আর বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন তৈরি করতে পেরেছে। কংগ্রেসের মধ্যেও তারা একটি উল্লেখযোগ্য প্রসার গ্রুপ। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান তেড়ে এসেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ব্রিটেনের ত্রাহি ত্রাহি রব। খোদ কলকাতার খিদিরপুরে পড়েছে জাপানি বোমা। সুতরাং গান্ধির মানসিক পরিবর্তন নির্ধারিত ঘটনাপ্রবাহে।

গান্ধির দৃষ্টিতে 'ভারত ছাড়ো'র রূপটা কমন? গান্ধি ঠিক করে ফেলেছেন : গ্রামে গ্রামে চাষিরা করদান বন্ধ করে দেবে। লবণ আইন অমান্য করবে। পরে জমি কেড়ে নেবে। এর ফলে হিংসা দেখা দিতে পারে। তবে, গান্ধির ধারণা, তা চলবে বড়জোর দিন পনেরো। শহরের শ্রমিকরা কারখানা ছাড়বে, রেলের চাকা বন্ধ হবে, মুসলমানরাও অংশ নেবে। আন্দোলন হিংসার পথ নিলে কিংবা দীর্ঘদিন হিংসাত্মক কার্যকলাপ চললে গান্ধি কি আন্দোলন বন্ধ করে দেবেন আগের মতো? গান্ধির উত্তর : 'আগে আমি বেশি সাবধানী ছিলাম। ... কিন্তু আগের মতো আমি আর চলব না।'

সুতরাং গান্ধি এবার যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তা সর্বাত্মক, তাতে হিংসারও স্থান আছে। নৈরাজ্যের ঝুঁকি আছে। ব্যাপক গণসংগ্রাম, স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট, খাজনা বন্ধ সবই আছে। কিন্তু এ হেন বৈপ্লবিক কর্মসূচি নেওহরুর মতো সমাজতন্ত্রীর আপত্তিতে বানচাল

হয়ে যায়। এতে গান্ধি ভয়ানক রেগে যান। প্রয়োজনে গান্ধি আজাদ, নেওহরুকে, এমনকি অহিংসাকেও ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। ৪ঠা আগস্ট গান্ধি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের জন্য একটি নির্দেশনামা পাঠালেন। বলা হল, হরতাল দিয়ে আন্দোলন শুরু হবে। গ্রামে গঞ্জে সভা, মিছিল হবে, কংগ্রেসকর্মীরা সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলবে। স্বাধীনতার পর ভারতের তিরিশ কোটি জনগণই সরকার চালাবে—হিন্দুরা নয়, কংগ্রেস নয়। এ আন্দোলন ইংরেজ জাতের বিরুদ্ধে নয়, ইংরেজ শাসনের বজ্জাতির বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের খাতায় নাম না থাকলেও কেউ যদি সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাস করে তবে সে নিজেকে কংগ্রেসি ভাবতে পারে। তাকে শপথ নিতে হবে, হয় সে স্বাধীন হবে না হয় সে মরবে। সরকারি স্কুল কলেজের ছেলেরা আন্দোলনে সামিল হবে। রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করতে হবে। জমিতে যে চাষ করে সেই হবে জমির মালিক। জমিদার যদি কিষানের সঙ্গে সহযোগিতা করে তবেই খাজনা পাবে কিন্তু সরকার পক্ষে যোগ দিলে পাবে না।

দুদিন পরে গান্ধির মনে হল, তিনি বোধহয় একটু বেশি উত্তপ্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁর নির্দেশনামা বোধহয় একটু বেশি বিপ্লবী হয়ে পড়েছে। কারণ ৭ই আগস্ট তিনি যে বক্তৃতা দিলেন তাতে বেশ বোঝা গেল তিনি অহিংসা নীতি ছাড়েননি আর ইংরেজদের প্রতি তাঁর বিশেষ বিদ্বেষও নেই। ইংরেজ বন্ধুদের তিনি ভুলটা দেখিয়ে দিচ্ছেন; নইলে এ লড়াইটা আসলে নিজেদের লড়াই।

৮ই আগস্ট 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হল। প্রস্তাবে গান্ধির জ্বালাময়ী আগুন যথেষ্ট জুড়িয়ে গেছে। বলা হল, আন্দোলনের উদ্দেশ্য ভারতের মুক্তি নয়—উদ্দেশ্য স্বাধীন দেশগুলির যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বনিরস্ত্রীকরণ এবং বিশ্বশান্তি। কথা উঠতে পারে, ৮ই আগস্টের প্রস্তাব নেওহরুর রচনা, গান্ধির নয়। কিন্তু গান্ধি তো শেষমেশ এই প্রস্তাবই আনুমোদন করেছিলেন। তিনিই তো অনুমোদন করেছিলেন আগস্ট প্রস্তাবের এই ধারা সে যদি কোনও কারণে কংগ্রেস কমিটি নির্দেশনা পাঠাতে পারে তবে প্রত্যেক আন্দোলনকারীই আপন পথ স্থির করে নেবে। যাই হোক, ৮ই আগস্ট এ আই সি ভারত ছাড়োর প্রস্তাব নিল আর ৯ই আগস্টের ভোরে গান্ধিসহ সব ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সরকার গ্রেপ্তার করল। গান্ধি জেলে যাবার আগে বলে গেলেন জাতির উদ্দেশ্যে : 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'।

গান্ধিসহ কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণির নেতৃবর্গের অনুপস্থিতিতে জনসাধারণ, বিশেষত নিম্নবর্গের মানুষ, কিভাবে ভারত ছাড়োতে সাড়া দিয়েছিল। গান্ধি বলেছিলেন, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। কিন্তু জনগণ যেভাবে সাড়া দিল তার অর্থ 'করো ইয়া মারো'। বাঙলার কথাই ধার যাক। বাঙলার সবচেয়ে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল মেদিনীপুরে। তমলুক, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, পটাশপুর, মহিষাদল অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। তমলুকে জাতীয় সরকার গঠিত হয়। জমিদারদের ধান লুট করে, থানা আক্রমণ করে, কাছারি লুট করে অর্থ সংগ্রহ চলছিল। তবে কমিউনিস্টরা সরকারকে সাহায্য করেছিল, কোথাও কোথাও মুসলিমরাও।

ওসবে গান্ধির সমর্থন ছিল না। গান্ধির সমর্থন ছিল না বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ব্যাপক হিংসাত্মক কৃষক অন্দোলনে। মোটকথা, দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষিদের কি কংগ্রেস, কি কমিউনিস্ট সকলেই বর্জন করেছিল। মার্কসবাদীদের কাছে কৃষকরা তো 'আলুর বস্তা' এদের বিপ্লবী চেতনায় তারা সন্দিগ্ধ। মার্কসবাদীরা এদের বর্জন করায় উঁচু-নীচু সবজাতের চাষিরা কংগ্রেসের পতাকার তলায় দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু গান্ধির দলও তাদের দুরবস্থার কোনও সুরাহা করেনি। পরিশ্রুত ভূমিসংস্কারে হাত নেয়নি। উপরন্তু যুদ্ধের সময়ে রেঙ্গুনের পতনের পর বাংলায় -বিহারে সব চাষির ঘরেই চাল বাড়ন্ত। ফলে মজুতদারি বাড়ে। ব্যবসায়ীরা চালের দাম বাড়িয়ে চাষিদের লোভ দেখাল চাল বেচতে। পরে তাদেরই কাছে দুঃসময়ে আরও দাম বাড়িয়ে তাদেরই বাধ্য করল কিনতে। চাল নিয়ে এই জালিয়াতির জবাব কৃষকরা দিয়েছিল লুটপাঠ রাহাজানির মাধ্যমে। গান্ধি চাইলেই এদের মনস্তাত্ত্বিক হিংসা রুখবেন কি করে?

ভারত ছাড়োয় কৃষকরা যোগ দেয় পুলিশি অত্যাচারের জবাবে, গান্ধির ভক্তদের প্ররোচনায়, জাতীয় আবেগে। কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাদের চিরাচরিত আর্থিক বিপর্যয়। কেরোসিন বাজার থেকে উধাও। খাদ্যদ্রব্য তো বটেই। পঞ্চাশের মন্বন্তরের গন্ধ যেন আগে থেকেই গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়েছে। খেতমজুরদের প্রকৃত মজুরি কমেছে। তাদের সংখ্যাধিক্যে বেকারি বাড়ছে, বাড়ছে চুরি ডাকাতি হাটপাট লুটতরাজ। মধুবনি, মুঙ্গেরে নিম্নবর্গের লোকেরা সারাদিন হাটপাট লুঠে ব্যস্ত ছিল। তারা লুঠ করত রেলস্টেশনে জমা খাদ্যশস্য। কংগ্রেস এসব পছন্দ করেনি, কিন্তু মেনে নিতে বাধ্য হয়। জিনিসপত্রের যা ন্যায্য দাম তার থেকে বেশি যদি ব্যবসায়ীরা দাবি করে তবে অভুক্তদের অধিকার আছে লুটপাট করার—এই মনস্তত্ত্ব সর্বত্র।

কংগ্রেসের আধ্যাত্মিক নিবাস গুজরাটে কৃষক আন্দোলনের ধারা বিচিত্র। গুজরাট রাজস্ব বা খাজনা দিতে অস্বীকার করেনি। কারম খেড়া, সুরাট আর ব্রোচের চাষিদের মনে হয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় খাজনা না দেওয়ার সরকার তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করেছিল। গান্ধিবাবা তাদের জনন্যে সরকারের কাছে নালিশ জানাতে পারেননি। সুতরাং নেড়া দুবার বেলতলা যেতে রাজি নয়। আন্দোলনে যোগ দেয় উঠতি ধনী চাষিরা যারা উঠতি দামের সুযোগ নিচ্ছিল। আন্দোলনে যোগ দেয় মূলত পটিদার সম্প্রদায় আর অনাবিল ব্রাহ্মণরা।

মহারাষ্ট্রে ভারত ছাড়োর লক্ষ্য শুধুমাত্র স্বাধীনতা নয়—মূললক্ষ্য শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র। সাতারায় 'সমান্তরাল সরকারের' প্রকৃতি হল ব্রাহ্মণ-বিরোধ। তার সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের অবসান ও উচ্চজাতের সর্বনাশ। এদের আন্দোলন কংগ্রেস পতাকার তলায় নয়, নয় কমিউনিস্ট কিষান সভায় ছত্রছায়ায়। তবে তারা গান্ধির দুটো কথা মেনে নিয়েছিল : করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। তাই টেলিফোন টেলিগ্রাফের তার কেটে, ট্রেন লুট করে তারা মনে করেছিল তারা গান্ধির পথেই অনুসরণ করছে। জনগণ মিছিল বের করে, সরকারি সম্পত্তি দখল করে।

সরকারের চরদের পা খোঁড়া করে দেয়, গড়ে তোলে সমান্তরাল গ্রামীণ পুলিশ বাহিনী। গান্ধিভক্তরা উপদেশ দেন, আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু কে শুনবে তাদের কথা।

১৯৪৪-এর ১লা আগস্ট খোদ গান্ধির কাছ থেকে ডাক এল আত্মসমর্পণের। জাতির জনকের এই আহ্বানে বাধ্য সন্তানরা সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু সাড়া দেয়নি অনেক 'দুর্বিনীত' নিম্নবর্গের মানুষ যারা স্ব স্ব স্থানে স্বয়ম্ভু নেতায় পরিণত হয়েছিল। তাদের বক্তব্য : গান্ধি যা বলছেন ঠিক। কিন্তু যতক্ষণ আমাদের প্রতিপক্ষের হাতে অস্ত্র আছে আমরা আত্মসমর্পণ করতে পারব না। এই 'প্রতিপক্ষ' কি শুধু বিদেশি সেনা, বিদেশি শাসন, ইংরেজ!

জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছিলেন, 'আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি, ব্রিটিশদের আগ্রাসী শক্তি বলে চিহ্নিত করেছি, আমরা তাই বোম্বাই প্রস্তাব অনুসারে ব্রিটিশদের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে ন্যায্য কাজই করেছি। যদি তা গান্ধির নীতির সঙ্গে না মেলে অপরাধ নয়।' সুতরাং জয়প্রকাশের অনুগামী ছাত্র-কৃষকরাও দায়ী হবে কেন? গান্ধি না জানতে পারেন, সকলেই জানে এটা কংগ্রেসি বিদ্রোহ। মুখে সবাই গান্ধির নাম নিয়েছে, সবাই জানে তারা গান্ধির পরিচালিত নয়। তাদের নির্দেশদাতা কোথাও জয়প্রকাশ, কোথাও অরুণা আসফ আলি, কোথাও কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, কোথাও বা ফরোয়ার্ড ব্লক। আবার, মেদিনীপুর, ইউ. পি., বিহার, গুজরাটে স্থানীয় নেতারাই নিজেদের মতো আন্দোলন চালিয়েছে। গাজিপুরের বিদ্রোহীরা মুখে গান্ধির নাম নিলেও তারা জানত তাদের প্রেরণা আসলে ভগৎ সিং। আবার সাতারায় গান্ধি বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণে ডাক দেন, তারা সে ডাকে সাড়া দেয়নি।

সুতরাং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে জনতা বা নিম্নবর্গের মানুষ কি গান্ধিকেও ছেড়েছিল? অনেক জায়গাতেই তো আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত। সেখানে নেতা তো গান্ধি নন, জনতাই। পাটনার ঘটনার বিবরণ যা দিয়েছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাতে তো তাই মনে হয়। মজঃফরপুরের রামকল ধনুক। তমলুকের গুণধর মণ্ডল কি নেতাদুরস্ত গান্ধিবাদী, নাকি নিম্নবর্গের আশা-আকাঙ্ক্ষায় মূর্ত বিগ্রহ। 'জাগরি'তে সতীনাথ বলছেন কবৈয়ার 'যে গরিব কিষাণের দল জীবনে কখনও প্রাণ খুলিয়া হাসিবার অবকাশ পায় নাই' তারাই দখল করেছিল বীরগাঁও থানা, তারাই গড়েছিল ব্যারিকেড 'টমি' আগমনের পথ রুদ্ধ করতে, তারাই স্লোগান দিয়েছে : 'বাম্বাইসে আই আওয়াজ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'

'জাগরী'তে কম্যুনিস্ট নীলু দেখল : 'এক বৈদ্যুতিক শক্তি সহসা দেশশুদ্ধ লোককে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা করিয়া দিয়াছে। যেখানে যাও, মনে হইতেছে যেন পাগলা গারদের ফটক খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিক্ষুব্ধ অথচ নেশাগ্রস্ত জনতা, কি করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ...যেখানেই তাহারা দল বাধিয়া যাইতেছে সেখানেই তাহাদের সম্মুখে শক্তির স্তম্ভগুলি ভূমিসাৎ হইয়া যাইতেছে ও অত্যাচারের প্রতীকগুলি মাথা নত করিয়া লইতেছে। ...খাসমহল কাছারির ম্যানেজার তাহাদের ভোজের আয়োজন করিয়া দেন, দারোগা সাহেব গান্ধিটুপি মাথায় দিয়া, ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে লইয়া তাহাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন, চৌকিদার তাহার উর্দি জ্বালাইয়া কাজে ইস্তফা দেয়। গরিব কিষাণের

আনন্দ, আর তাহাকে খাজনা দিতে হইবে না, চৌকিদারের ট্যাক্স দিতে হইবে না।'

'ঢোঁড়াই রচিত মানস'-এ সাঁওতাল নেতা বড়কা মাঝি থানা জ্বালিয়েছে, তিতলি কুঠি জ্বালিয়েছে, তারপর গান ধরেছে : 'রেল লাইন উঠিয়ে ফেললে/তো পা ভেঙে গেল সরকারের। তার কেটে দিলে/তো কান কেটে গেল সরকারের।' থানা জ্বালিয়ে দিলে/তো চোখ গেলে দিলে সরকারের'।

পাঁচ : উপসংহার

Frantz Fanon বলেছিলেন, 'Peasants alone are revolutionary in the colonial countries as they have nothing to lose and everything to gain.' ভারতের কৃষি-জনতা বা নিম্নবর্গের আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের বিবরণে বোধহয় কথাটা সবচেয়ে সত্যি প্রমাণিত হয়। এই শতকে কুড়ি ও তিরিশের দশক থেকেই বেশ কিছু তরুণ রুশ বিপ্লবের শিক্ষা নিয়ে এদেশের জাতীয় আন্দোলনে একটি অর্থনৈতিক মুক্তির ধারা সংযোজনের চেষ্টা করছিলেন। ভেঙে দিতে চাইছিলেন গান্ধিবাদী চালচিত্রটি। কারণ গান্ধি দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘধট বা কৃষক বিদ্রোহ মানতে পারছিলেন না। ১৯২১-২২-এ গুন্টুরে, পরে বারদৌলিতে কৃষক আন্দোলনের ডাক দিয়েও পিছিয়ে আসেন। উত্তরপ্রদেশের কৃষক আন্দোলনের রাশ টেনে ধরেছিলেন। তাই গান্ধি কৃষকদের তথা নিম্নবর্গের সহানুভূতি হারিয়েছিলেন তিরিশের দশকেই। ১৯৪২ সালের ঘটনাকে তাই অনেকে বলেছেন বহতা কৃষক আন্দোলনের মোহানা।

গান্ধি নিম্নবর্গের হারিযে যাওয়া অধিকারের আগুন জাতীয় মুক্তির আন্দোলন জ্বালাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ক্রমশই বুঝতে পারছিলেন যে কংগ্রেস রাজনীতি থেকে তারা ধীরে ধীরে খণ্ড ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। গান্ধির কংগ্রেস কিংবা কংগ্রেসের গান্ধি কখনই গ্রামীণ ভারতের শোষণের মূলটিকে আঘাত করতে সাহস করেনি। ১৯২০-২২ আর ১৯৩০-৩৪-এ যে গণ-আন্দোলন তা প্রত্যাহার করার পিছনে প্রধান ভয় বোধহয় 'করবর্জন' যা সামন্ততন্ত্রকেই আঘাত করত। সহজানন্দ সরস্বতী, যিনি গান্ধির প্রভাবে রাজনীতিতে এসেছিলেন, পরে মোহভঙ্গে বুঝতে পেরেছিলেন : 'The difference between the Government and the alien Government shall be in name only. In reality it will be the same. The loot of the Kisans and Mazdurs would continue unabated.'

১৯৩৬ সালে All India Kisan Congress গঠিত হল। উদ্দেশ্য, পূর্ণ স্বরাজ। কৃষক ও শ্রমিকদের শোষণমুক্তি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন। কৃষকদের এই সংগঠনে বামশক্তির ভূত দেখে প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেসিরা চমকে ওঠেন। কিষাণ সংগঠন নিষিদ্ধ হল; গান্ধির আশীর্বাদ ধন্য পাল্টা সংগঠন গড়ে উঠল All India Trade Union Congress. একদিকে নিম্নবর্গের সংগঠনে প্রবল ঘৃণা, অন্যদিকে এদেরই সংগঠনকে ব্যবহার করার লালসা। কিন্তু এরাও কংগ্রেসের লেজুড় হয়ে থাকতে চায়নি। গড়ে উঠেছে All India Kisan Sabha, কৃষি বিপ্লব এদের লক্ষ্য। শুধুমাত্র প্রান্তিক কৃষকদেরই নয়। গ্রামীণ প্রোলেতারিয়েতেদেরও এরা আগে নিতে চায়। কারণ সহজানন্দরা বুঝেছিলেন, শহরাঞ্চলের

প্রোলেতারিয়েতের একটা বড় অংশ কৃষি উদ্বৃত্ত যারা কৃষিক্ষেত্রে টিকতে না পেরে ভাগ্যান্বেষণে শহরে কারখানায় এসেছে।

দেখা যাচ্ছে, ছোট চাষি, প্রান্তিক চাষি, মাঝারি চাষি সমস্ত নিম্নবর্গীয় ভূমিজ মানুষজনই একটি সংহতিসূত্রে জাতীয় আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। আইন অমান্যে এরা ব্যাপক অংশ নিয়েছে। কিন্তু ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯-এ নতুন কংগ্রেস সরকার কৃষকদের স্বাচ্ছন্দ্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচন জিতে কৃষকদের কথা ভুলে গেল। জমিদারি স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। স্বভাবতই কৃষকরা কংগ্রেস ও রাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটায়। ১৯৪২-এর আন্দোলনে কিষাণ রাজনীতি আবার উগ্রমূর্তি ধারণ করল। কিন্তু কংগ্রেসিরা রাজনীতির ভূগোলে এদের সঠিক অবস্থান কেউ স্থির করতে পারেনি। গান্ধিও না। জাতীয়তাবাদী নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের শ্রেণিবৈষম্যজনিত সংঘর্ষকে অপ্রধান রেখে শাসকজাতির স্বার্থ সংঘর্ষকে প্রাধান্য দেওয়া। কৃষকচৈতন্য এই স্বার্থের খেলাকে বুঝতে ভুল করেনি। তাই তারা গান্ধির নেতৃত্ব মেনেছে এবং মানেওনি।

* সৌজন্যে : দেশ পত্রিকা, ১৩ আগস্ট — ১৯৯৪।